দাভানগেরে

পলিয়েস্টার ড্রেস মেটিরিয়াল

জাসমিন, মার্ভেল, অ্যালমণ্ড, মোহিনী

আপনার মধ্যে জাগিয়ে তুলবে স্টাইল আরাম আর সৌন্দর্য

MAP/DCM/53 BEN

দাভানগেরে

ফ্যাশন

ফ্যাব্রিক্স

দি দাভানগেরে কটন মিলস লিমিটেড, দাভানগেরে-৫৭৭ ০০২।
শাড়ী, স্যুটিং শার্টিং, ড্রেস মেটিরিয়াল, লংক্লথ আর ধুতির উৎপাদক।

শোরুম: কাবেরী ভবন, ব্যাঙ্গালোর-৫৬০ ০০৯। শিবাজীনগর, তুমকুর-৫৭২ ১০১।
বিদ্যুৎ রোড, দাভানগেরে-৫৭৭ ০০২। হোসাপেটে রোড, চিত্রদুর্গ-৫৭৭ ৫০১।

সূচীপত্র

দেশ

৯ বৈশাখ ১৩৯৬ ☐ ২২ এপ্রিল ১৯৮৯ ☐ ৫৬ বর্ষ ২৫ সংখ্যা

প্র চ্ছ দ নি ব ন্ধ

অমিয়কুমার সরকার ☐ হিমালয়ে সবুজের অভিযান ☐ ১৯
কুমুদরঞ্জন নস্কর ☐ সুন্দরবনের উদ্ভিদ ☐ ২৫
অমিয়াংশু চট্টোপাধ্যায় ☐ মরুতে মরুতে মরূদ্যান ☐ ৩১
দুলালচন্দ্র পাল ☐ পতঙ্গভুক উদ্ভিদের ফাঁদে ☐ ৩৫

বি শে ষ নি ব ন্ধ

সন্দীপ দাশগুপ্ত ☐ নীল বণিকের অন্তিম দর্পণ ☐ ৫৭

ভ্র ম ণ

তনুকা ভৌমিক ☐ এই তো ভালো লেগেছিল ☐ ৭৭

সা ক্ষা ৎ কা র

দেবাশিস দাশগুপ্ত ☐ উদাসী বাউল : হিসেবী বৈরাগ্য ☐ ৮৮

বি জ্ঞা ন

সমরজিৎ কর ☐ যে শক্তি পরমাণুর অভ্যন্তরে ☐ ৭৪

প ত্রা ব লী

বুদ্ধদেব বসুর চিঠি : কনিষ্ঠা কন্যাকে ☐ ৫৪

খে লা

তপন ঘোষ ☐ সাফল্যের উপেক্ষা ☐ ১০১
গৌতম ভট্টাচার্য ☐ খেলার খুচরো খবর ☐ ১০৭

অ নু বা দ ক বি তা

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ☐ গাথা সপ্তশতী ☐ ৮৩

ক বি তা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ☐ উজ্জ্বল সিংহ
সুব্রত রুদ্র ☐ অনীতা অগ্নিহোত্রী ☐ ১৭

গ ল্প

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ বর্ণ পরিচয় ☐ ৩৯
চণ্ডী মণ্ডল ☐ অমলকান্তি ☐ ৪৮

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

সমরেশ মজুমদার ☐ সাতকাহন ☐ ৬৫
সুব্রত মুখোপাধ্যায় ☐ রসিক ☐ ৭০

র ম্য র চ না

দুলেন্দ্র ভৌমিক ☐ শকুন অথবা শৃগাল ☐ ১৮

নি য় মি ত

চিঠিপত্র ☐ ৭ ☐ সম্পাদকীয় ☐ ১৫ ☐ সাহিত্য ☐ ১০৮
গ্রন্থলোক ☐ ১১১ ☐ শিল্পসংস্কৃতি ☐ ৯৬ ☐ অরণ্যদেব ☐ ৯৫

প্র চ্ছ দ

মনোজ দত্ত

সম্পাদক সাগরময় ঘোষ

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ২০ পয়সা। উত্তর-পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা।

এই তো ভালো লেগেছিল

তনুকা ভৌমিক

বিশেষ চিতল হরিণের দল

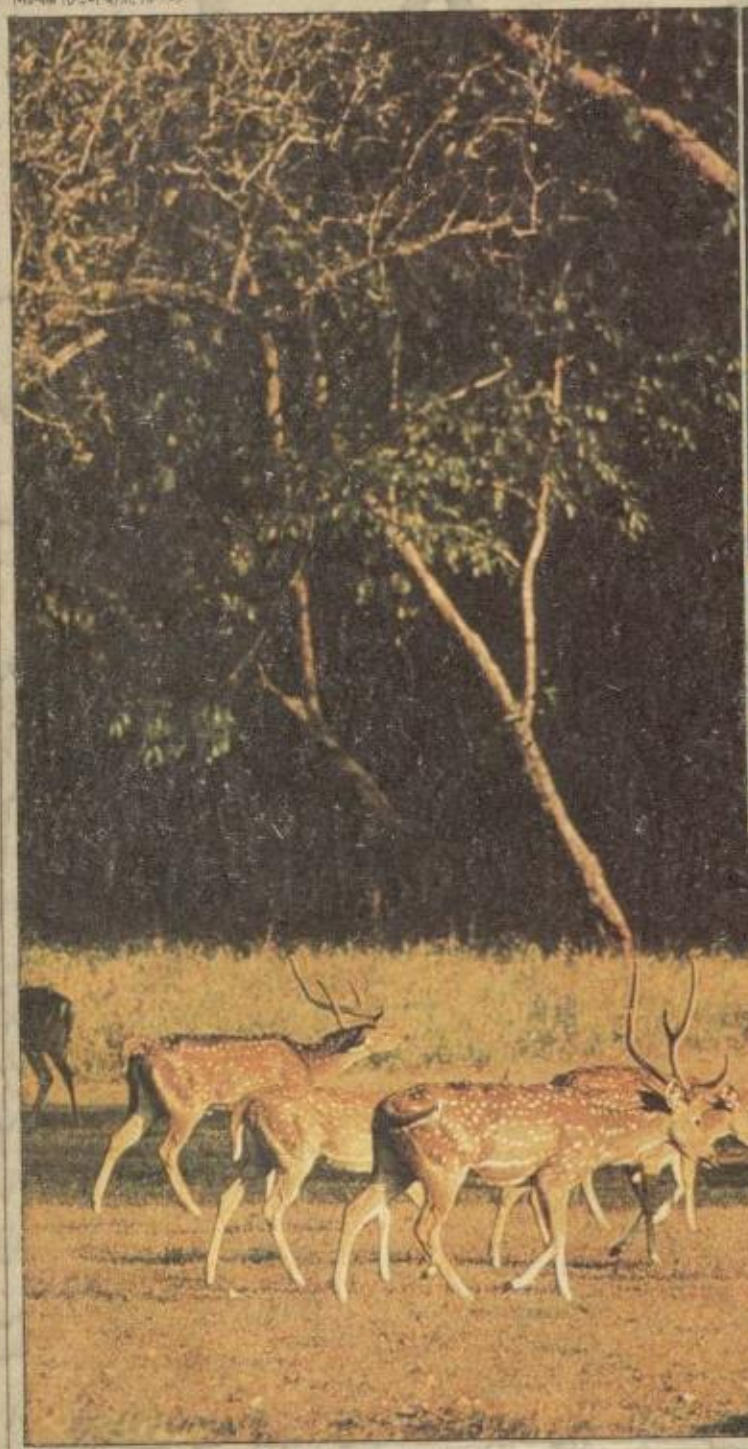

অরণ্যের পথে আলোছায়ার খেলা

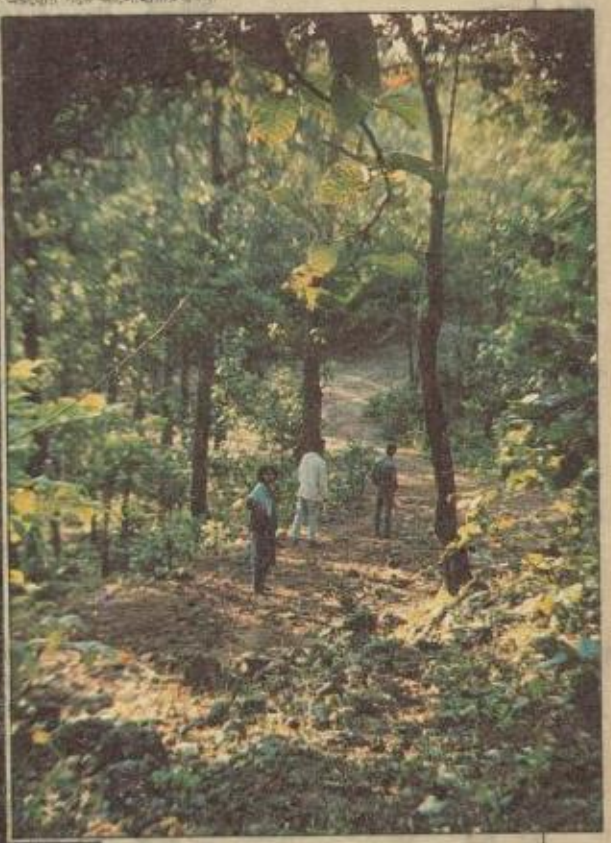

সন্তানসহ বাঁদর-মা । সতর্ক, সন্দিহান

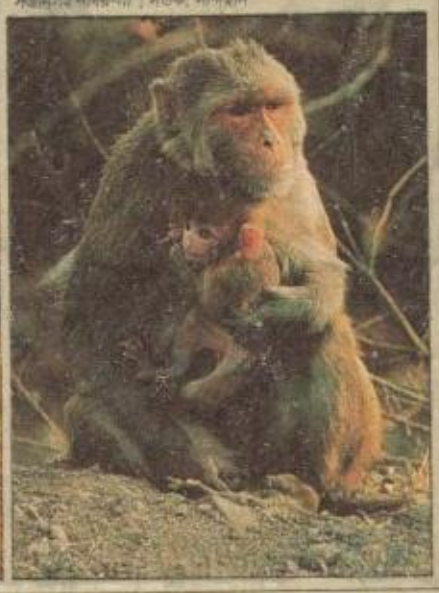

বর্ণিল ফড়িং : ব্র্যাকাইথেমিস কন্ট্যামিনাটা

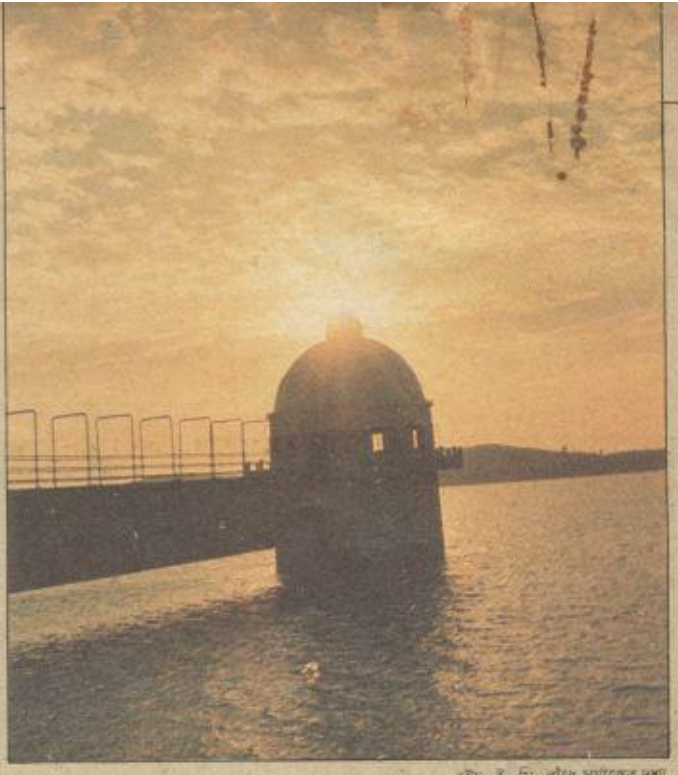

এইচ. ই. সি. বাঁধে সূর্যাস্তের দৃশ্য

রাঁচী-বেতলা-নেতারহাট। অনেকদিন পাহাড় পাহাড় করে মন টানছিল, তাই ঐ অঞ্চলের পাহাড় সম্বন্ধে সেরকম প্রশংসা না শুনলেও দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে বেরিয়ে পড়েছিলাম রাঁচীর উদ্দেশ্যে। হিমালয়ের শুভ্র সৌন্দর্যের ছবিকে ছাপিয়ে পালামৌ-এর পাহাড় ও জঙ্গল তার সবুজ রঙে মন ভরিয়ে দিল।

রাতের ট্রেন হাওড়া-হাতিয়া এক্সপ্রেস ধরে রাঁচী পৌঁছলাম পরের দিন সকাল সাতটা নাগাদ। পৌঁছেই মনটা দমে গেল। ছোটবেলা থেকে স্বাস্থ্যকর পাহাড়ী জায়গা হিসেবে রাঁচীর গল্প শুনে আসায় মনে মনে কল্পনা করে নিয়েছিলাম সুদৃশ্য ছিমছাম এক শহর, উঁচু-নীচু রাস্তা, চারদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। অথচ গিয়ে দেখলাম ধুলো যানবাহনের ধোঁয়ায় ভরা এক অতি-পরিচিত মফস্বল শহর। বৈশিষ্ট্য হিসাবে এই যে দু'পা যেতে না যেতেই একটি করে 'ওয়াইন শপ' বা মদের দোকান। বন্ধুদের সাবধানবাণী মনে পড়ল—'সন্ধে ছ'টার পর একদম রাস্তায় বেরোবি না। খুব খারাপ জায়গা।' সব মিলিয়ে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে হোটেলে গিয়ে উঠলাম। স্থির করলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাঁচী থেকে বেরিয়ে নেতারহাটের দিকে রওনা হব। সঙ্গীদের পরামর্শে অবশ্য এর পর আরও দু'দিন থেকে গেলাম। পরে দেখলাম থেকে ভালই করেছি। রাঁচী থেকে আশেপাশে দর্শনীয় অনেক জায়গা আছে—যেমন দশম ফলস, হুড্রু ফলস, কাকে বাঁধ, রাজরাপ্পা মন্দির, এইচ. ই. সি. বাঁধ, ক্রোকোডাইল ফার্ম, ট্যাগোর হিল, ইত্যাদি। হুড্রু ফলস্ ছাড়া আর সব কটি জায়গায় আমরা গেছি।

সবুজ বনভূমি ভরে আছে নাম-না-জানা ফুলের বিস্ময়ে

প্রতিপক্ষকে গলা-ফুলিয়ে ভয় দেখাচ্ছে ক্যালোটেস গিরগিটি

দশম ফলস্ (বা জলপ্রপাত) সত্যিই দর্শনীয়—পাহাড়ের উপর থেকে দশটি জলের ধারা নেমে এসে এই জলপ্রপাত তৈরী করেছে। যেখানে জলের স্রোত ঝাঁপ দিয়ে নীচে পড়ছে, সেখান অবধি যাওয়া আবার উপর থেকে জলপ্রপাতের দৃশ্য দেখারও ব্যবস্থা রয়েছে। নীচে নামার ধাপে ধাপে ফলস-এর দৃশ্য দেখার জন্য পাহাড়ের গায়ে জায়গা তৈরী করে দেওয়া হয়েছে; তাতে বসবার জন্য বেঞ্চের ব্যবস্থাও আছে, যার অদূরেই জলপ্রপাতের নয়নাভিরাম দৃশ্য। মনে আছে, নীচে জলপ্রপাতের জলে পা ডুবিয়ে, পাথরের উপর যথেচ্ছ ঘুরে বেড়িয়ে আবার উপরে এসে এরকম একটি বেঞ্চে বসেছি—এমন সময়ে দেখি কিছু মেয়ে ও ছেলে এসে একটু নীচে একটি বেঞ্চের সামনে সতরঞ্চি পাতছে। কিছুক্ষণ পরে তারা নিয়ে এল ইজিচেয়ার ও কয়েকটি মোড়া—সবই বসান হল এমনভাবে যাতে জলপ্রপাতটি পরিষ্কারভাবে সেখান থেকে দেখা যায়। অবাক হলাম পরের দৃশ্যটি দেখে; এই ছেলে ও মেয়ের দল (পরে বুঝলাম এরা পরিচারক-পরিচারিকা বা attendant) কোলে করে কিছু বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েকে এনে তাদের সতরঞ্চি ও ইজিচেয়ারে বসাল। দুটি বিকলাঙ্গ ছেলে ক্রাচে ভর দিয়ে নিজেরাই নেমে গেল বেঞ্চের কাছে।

ছবি : জেরাল্ড কিউবিট

বিকলাঙ্গ মেয়েগুলির পোশাক একরকম, মাথায় এক রঙের ফিতে, ছেলেদের পরনে একই ধরনের চেককাটা শার্ট ও প্যান্ট। উপর দিকে নজর করে তাকাতে দেখলাম একটি মিশনারী প্রতিষ্ঠানের বাস দাঁড়িয়ে—হয়ত একটা ছুটির দিন কাটাতে সবাই মিলে বাসে করে এই দশম ফলস দেখতে এসেছে। বিকলাঙ্গ ছেলে-মেয়ের দলটি পাহাড়ের ঢালের যতদূর সম্ভব কাছে বসে গলা বাড়িয়ে নির্নিমেষ চোখে দেখতে লাগল কিভাবে পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে পড়া দুধ-সাদা জলের স্রোত বয়ে চলেছে নীচে। অনেক নীচে পাথরের উপর দেখা যায় ছোট বাচ্চারা অবিশ্রান্ত খেলে বেড়াচ্ছে, কেউ বা জলপ্রপাতের এক ধারে ছিটকে-পড়া জলে সেরে নিচ্ছে স্নান, আবার কেউ বা বিরাট উপলখণ্ডের উপর বসে উপভোগ করছে জলের কলধ্বনি। অথচ এই বিকলাঙ্গ বাচ্চাগুলির উপায় নেই নীচে নেমে তাদের ভাইবোনেদের সঙ্গে যোগ দেবার। দূর থেকে জলের খেলা দেখেই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে, হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারবে না সেই জলের ফেনা। তখনই উপলব্ধি করলাম কত ভাগ্য করে এসেছি আমি; যে হাত-পায়ের জোরকে অনায়াসে ভুলে থাকি, যে হাঁটা-চলা-লাফানোকে জন্মগত অধিকার বলে ধরে নিই। সেগুলোকেই হঠাৎ দুর্মূল্য উপহার বলে মনে হল, যেন অনেক ভাগ্যে এমন বর মেলে।

রাঁচীর খুব কাছে কাকে বাঁধ ও এইচ· ই· সি· (Heavy Engineering Corporation Ltd) বাঁধ দুটিই মানুষের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার সুন্দর উদাহরণ। এর মধ্যে শেষেরটির দৃশ্য বেশী মনোরম লেগেছে। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ঝলমলে পাহাড়-ঘেরা হ্রদের ছবিটি এখনও যেন চোখে লেগে আছে। আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল

চেরো রাজাদের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ

ছিল হাজারীবাগের রাজরাপ্পা মন্দির। এই মন্দির দেখতে যেতে রাঁচী থেকে গাড়িতে সময় লাগে প্রায় তিন ঘন্টা। রামগড় হয়ে রাজরাপ্পা মন্দিরে যাবার এই পথটি পাহাড়ের উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে উঠেছে—দু'পাশে রয়েছে গাছের সমারোহ। মন্দির-প্রাঙ্গণ এবং সংলগ্ন দুটি নদ-নদীর সঙ্গমস্থল বেশ নোংরা। এর প্রধান কারণ এখানে প্রচলিত পাঁঠা-বলির প্রথা যার ফলে মন্দিরের পাশের নদীতটে পাথরের খণ্ডগুলির উপর ছড়ানো রয়েছে পাঁঠার শিং, খুর, হাড়গোড় এবং পাথরের গায়ে লেগে আছে রক্তের দাগ। দামোদর নদ ও ভৈরবী নদীর সঙ্গমস্থল হিসাবে এর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে এক বৃদ্ধ পুরোহিত বললেন যে নারী-পুরুষের সঙ্গমরীতির বিপরীত ধারায় এখানে দামোদর নদের উপরে এসে মিলিত হয়েছে ভৈরবী নদী। সত্যি বলতে কি অবিশ্বাসী হিসাবে আমার মন্দির ও নদীতটের তুলনায় রাজরাপ্পায় আসার পাহাড়ী পথটি অনেক বেশী সুন্দর লেগেছে।

সুউচ্চ গাছেরা গায়ে গা ঠেকিয়ে তৈরি করেছে দুর্ভেদ্য বনভূমি

রাজরাপ্পা থেকে ফেরার পথে ক্রোকোডাইল ফার্মে পৌঁছতে বেশ কিছুটা কাঁচা সড়কের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। লাল মাটির রাস্তার দু'ধারে ওখানকার আদিবাসীদের গ্রাম। বাইরে থেকে দেখে মনে হল এরা খুবই গরীব যেটা হয়ত ঐ অঞ্চলে চুরি-ডাকাতির ঘটনা বাড়ার অন্যতম কারণ। গ্রাম পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দেখা গেল ক্রোকোডাইল ফার্ম। নির্জন জায়গা, গা-ছমছমে পরিবেশ। আমরা ছাড়া তখন আর কোন ট্যুরিস্ট ওখানে ছিল না। ফার্মে দেখি বিভিন্ন খাঁচার মধ্যে নানা ধরনের ও মাপের কুমীর। এর মধ্যে কয়েকটি অতিকায় ও নিশ্চল—যেন প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের মত যুগ যুগ ধরে ওখানে পড়ে আছে। ক্রোকোডাইল ফার্মটির আশপাশ সবুজ জঙ্গলে ঘেরা, সমতল নয়—একটু উঁচু-নীচু। বাইনোকুলার দিয়ে দূরের জঙ্গলে চোখ ফেলে মনে হল এত ঘন বনে বড় জানোয়ার থাকা আশ্চর্য নয়; ওখানকার গাইডও অনেক বাঘ-ভাল্লুকের গল্প শোনাল। চারদিকে থেকে থেকে পাখির ডাক ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই, ছায়া-ছায়া জঙ্গলের কি যেন আকর্ষণ, মাথার উপরে বিশাল গাছে জড়িয়ে ওঠা বুনো লাল অর্কিডের সমারোহ—সব মিলিয়ে মন চাইছিল আরও কিছুক্ষণ থেকে জঙ্গলের রহস্যকে একটু কাছের থেকে অনুভব করি। কিন্তু তখন বেলা পড়ে এসেছে, বাঘের গল্পকে আর গল্প বলে মনে হচ্ছে না। সঙ্গের গাইডটি অবশ্য বনের

জানোয়ারের থেকেও ডাকাতদের সম্বন্ধেই বার বার সাবধান করতে লাগল আর বাধ্য হয়েই আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম রাঁচীর উদ্দেশে।

যে রাঁচীকে প্রথম দর্শনে মোটেই পছন্দ হয়নি, এ কদিনে তাকেই ভাল লাগতে শুরু করেছিল। আমাদের হোটেলের খুবই কাছে গেলাম রাঁচীর আর একটি ট্যুরিস্ট স্পটে—ট্যাগোর হিলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পাহাড়ে একটি বাড়িতে বছরের কিছুদিন কাটাতেন। রবি ঠাকুরের বাড়ির ভগ্নাবশেষ এখনও সুন্দর; চাঁপা ও অন্যান্য ফুলগাছের সমারোহে চারদিকে ভরা, বিশেষত ছাদে বসতে খুবই ভাল লাগে। ছাদের থেকে দেখা যায় পাহাড়ের নীচে ক্ষেত, বাড়ি ও দূরে আরও কিছু পাহাড়ের সবুজে, খয়েরীতে মেশা এক অপূর্ব দৃশ্য। এই দৃশ্য অবশ্য আরও মনোলোভা পাহাড়ের একদম চূড়া থেকে। রবীন্দ্রনাথের বাড়ির থেকেই ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে ট্যাগোর হিলের মাথা অবধি। উপরে পাথরে দাঁড়িয়ে বিকেলের সোনালি আলোয় চোখ ভরে দেখলাম পাহাড়ের কোলের কাছে ছড়ানো সবুজ মাঠ, ধানক্ষেত, পুকুর, রাঁচী শহরের অনেক ছোট্ট ছোট্ট বাড়ি, পিপড়ের মত দু-একটি লোক আর এ সবের মধ্যে মাথা-উঁচানো আরও কয়েকটি পাহাড়। সারাক্ষণ কবিত্ব করে অবশ্য আমাদের মন ভরেনি। যাদের লাফ-ঝাঁপ করার অভ্যাস, তারা এরই মধ্যে লেগে গেলাম এক পাথর থেকে আর এক পাথরে লাফিয়ে বেড়াতে। পাহাড় চড়ার নেশা যাদের, তাদের এরকম পাথুরে পাহাড় হাতের কাছে পেলে কিছুতেই ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করবে না। পা না হয় একটু ছড়েই গেল, জামা না হয় চোর-কাঁটায় ভর্তি, কিন্তু পাহাড়ে এসে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব, তাও কি হয়!

দেখতে দেখতে আমাদের রাঁচীর পাত্তাড়ি গুটানোর পালা এগিয়ে এল। 'নেক্সট স্টেশন' বেতলা—জঙ্গলের একেবারে মধ্যিখানে। বিহারের পালামৌ জঙ্গলের অংশ বেতলা ন্যাশনাল পার্ক; রাঁচী থেকে গাড়িতে যেতে সময় লাগে সাড়ে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা। রাঁচী থেকে বেতলা যাবার পথটি বেশ সুন্দর—কখনও পথের দু'ধারে হলুদ সর্ষের ক্ষেত, ছোট্ট গাঁয়ের বাড়ি-ঘর, পিছনে সবুজ পাহাড়ের সারি, কখনও আবার বনের মধ্যে দিয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে কালো পিচের রাস্তা। কত নাম না জানা গাছ চকিতের জন্য তাদের মুখ দেখিয়ে দিল, কত অচেনা পাখির ডাক মনে গেঁথে রইল। হঠাৎ মনে হল, আরে! এই সুন্দর পাহাড়ী রাস্তায় গাড়িতে ছুটে চলেছি, বনের ঠাণ্ডা হাওয়ায় গা সিরসির করছে, আর ঠিক এই সময়ে কলকাতায় লোক ট্রামে-বাসে করে অফিসে, স্কুল-কলেজে যাচ্ছে, ধুলো আর ধোঁয়ার মধ্যে ব্যস্ত দিন গড়িয়ে চলেছে। নাঃ, ঠিক যেন বিশ্বাস হল না। এই শ্যামল প্রকৃতির মাঝখানে বসে কলকাতাকে মনে হল এক অচেনা গ্রহ। এই যে জঙ্গলের পাতার ফাঁকে আলো-ছায়ার খেলায় চোখ আটকে আছে, এই যে আঁকাবাঁকা পথ মাইলের পর মাইল ধরে আমাদের নিয়ে চলেছে না জানি কোন ঘন বনের মাঝখানে, এই জগৎই এখন আমার কাছে সত্যি—এটাই বাস্তব।

বেতলা পৌঁছলাম যখন, তখন বেলা গড়িয়ে প্রায় বিকেল। গাড়ি এসে দাঁড়াল বিরাট শাখা-প্রশাখা মেলে দেওয়া এক গাছের তলায়। কিছুদূরে দেখতে পেলাম সংরক্ষিত অরণ্য এলাকায় ঢোকার গেট—তাতে দু'ধারে দুটো শিং-উঁচানো বাইসনের প্রতিকৃতি। অল্প দূরে দেখি একটা কাঠের দোতলা কাঠামো, সামনে একটা খোলা বারান্দার মতন অংশ। পরে শুনলাম দোতলা সমান উঁচু ঐ প্ল্যাটফর্ম থেকে হাতীর পিঠে চড়তে হয়। বেতলায় আসার আগেই শুনেছি যে ওখানে সন্ধেবেলা ভ্যানে করে ট্যুরিস্টদের নিয়ে যায় বনের ভিতরে—সার্চলাইটের আলোয় জীবজন্তু দেখানোর জন্য। সেখানে যাওয়ার আগে আমরা ট্যুরিজম ডিপার্টমেণ্টের ভ্যানেই গেলাম বনের মধ্যে একটা পুরনো কেল্লা দেখতে।

একটু খোলা-মেলা, মানুষের বানানো সভ্য পরিবেশ ছেড়ে গাড়ি ঢুকল ঘন জঙ্গলের রাস্তায়। দুপাশে উঁচু উঁচু গাছ, গাঢ় সবুজ জঙ্গল ভেদ করে চোখ বেশীদূর পৌঁছয় না, মাঝে মাঝে মরা নদী, কোনটার পাশে শুকনো গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে। রাস্তার ঢাল বেয়ে দারুণ গতিতে চড়াই-উৎরাই করে আমাদের ভ্যান পৌঁছে দিল ঘন বনের মাঝখানে একটু ছোট্ট খালি জায়গায়। গাড়ি থেকে নেমেই চমকে উঠলাম—সামনে বিশাল এক দুর্গের গেট, এই ছায়াচ্ছন্ন বনের মাঝখানে এত অপ্রত্যাশিত যে বলার নয়। আমরা ওখানে পৌঁছতে অরণ্যের শান্তি যে বিঘ্নিত হয়েছে তা বুঝলাম আশেপাশে দৈত্যাকার গাছগুলোয় ডালপালার হঠাৎ আলোড়নে। দেখি লম্বা লম্বা ল্যাজ ঝুলিয়ে অনেক হনুমান এ গাছ থেকে ও গাছে অবলীলাক্রমে লাফ দিয়ে পাতার ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। অবশ্য ভগ্নপ্রায়, প্রাচীন কেল্লা দেখে পা অজান্তেই চলতে শুরু করেছে কেল্লার প্রবেশদ্বারের দিকে। ঢুকে দেখলাম দুর্গটি খুবই ভাঙাচোরা, বহু জায়গায় ইঁট-বালি খসে পড়েছে, আসল দুর্গের খুব কমই অবশিষ্ট আছে। তাও সিঁড়ি বেয়ে ছাদে ওঠা যায়—সে সিঁড়ি বেয়ে ওঠাও এক অ্যাডভেঞ্চার? সব সিঁড়িই ক্ষয়ে যাওয়া, খুব সাবধানে না উঠলে পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী। উঠে অবশ্য চারদিক দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। চতুর্দিকে মহীরুহের সমাবেশ তো আছেই, দূরে যতদূর চোখ যায় রয়েছে পাহাড়। সেই গোধূলিবেলায় নিশ্ছিদ্র অরণ্যে ঢাকা পাহাড় তার সব রহস্য নিয়ে মনের কোন কোণ আকর্ষণ করেছিল জানি না, তবে একথা বলতে পারি যে মনের একটা টুকরো সেদিন ওখানেই ফেলে রেখে এসেছি। পাহাড় ও সমুদ্রের নেশার মত জঙ্গলেরও যে একান্ত একটা জাদু আছে, তা ততক্ষণে উপলব্ধি করতে পেরেছি। পাহাড়ের সারির থেকে কাছের ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোতে চোখ ফিরিয়ে আনতে আবার কয়েকটা হনুমান চোখে পড়ল। দুর্গের ছাদের অন্যান্য দিক ঘুরে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছি, এমন সময়ে গাইড চেঁচিয়ে আর এগোতে বারণ করল। গলা বাড়িয়ে দেখি একটু সামনে আর ছাদের দেওয়াল নেই, ধসে পড়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। যেটুকু আছে, তাতে ঘাস গজিয়ে, ছোট ছোট গাছ হয়ে একাকার। মূল কেল্লার আশেপাশে আরও কয়েকটি ভাঙাচোরা বাড়ি দেখা গেল, কিন্তু সেগুলো এতই জঙ্গলে আকীর্ণ যে সাপখোপের ভয়ে আর গিয়ে দেখার সাহস হল না। এই প্রাচীন কেল্লার ইতিহাস সম্বন্ধে কিন্তু গাইডের কাছ থেকে কিছুই জানা গেল না। শুধু tourist brochure-এ এটুকু তথ্য পেলাম যে ওটা 'chero' রাজাদের আমলে তৈরী।

কেল্লা থেকে বেরোতে সন্ধে হয়ে গেল। আবার ভ্যানে করে ছোটার পালা—এবার বাইসনের ছবি আঁকা সেই গেটের উদ্দেশে। সেই গেটের পিছনে আছে সংরক্ষিত বনাঞ্চল, যেখানে

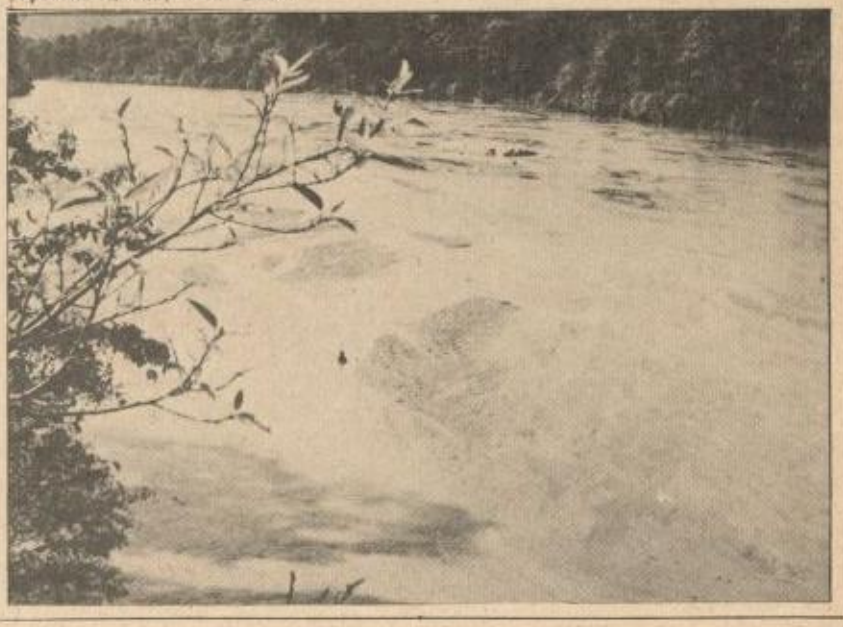

বিস্তৃত নদীর তীরে নিবিড় জঙ্গলের হাতছানি

সার্চলাইটের আলোয় জানোয়ার দেখার সুযোগ পাব আমরা। সার্চলাইট ফেলার জন্য ভ্যানে একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা ছিল—ভ্যানের ছাদে একটা চৌকো অংশ খোলা। আমাদের গাইড সিটের উপর দাঁড়িয়ে সেই খোলা অংশ দিয়ে মাথা থেকে কোমর অবধি গাড়ির বাইরে বার করে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, হাতে সার্চলাইট। গাড়ি গেটের ভিতর দিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করতে সে হাত ঘুরিয়ে বনের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত সার্চলাইটের আলো ফেলতে লাগল। দেখাদেখি আমরাও দু-একজন তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে অভিজ্ঞতা ভোলার নয়। প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি ছুটে চলেছে জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে, কানে-মাথায় চাদর মুড়ি দেওয়া সত্ত্বেও পাশ দিয়ে হুহু করে বইছে রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া, আর সার্চলাইটের আলো বনের এক প্রান্তকে আলোকিত করে পর মুহূর্তেই সরে যাচ্ছে সামনের এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার উপর, আবার তার পরই সে আলোয় বনের অন্য ধার যেন জীবন্ত হয়ে উঠছে। সেই আলো-আঁধারিতে বিশাল বিশাল গাছগুলোকে মনে হচ্ছে দিনের তুলনায় আরও রহস্যময়, আরও ভৌতিক। আমারও নেশাগ্রস্তের মত সার্চলাইটের সঙ্গে সঙ্গে এধার থেকে ওধারে মাথা ঘুরাচ্ছি—হঠাৎ দেখি অন্ধকারে কয়েকজোড়া চোখ জ্বলজ্বল করছে। ভাল করে আলো ফেলাতে দেখি হরিণের একটি দল নিশ্চিন্তে ঝোপের আশেপাশে শুয়ে আছে। আলো পড়তে দু'একটি সরে গেল, একটি আবার শিং উঁচিয়ে ঝোপের পিছনেই বসে রইল। স্বাভাবিক পরিবেশে অপূর্ব লাগল এই দৃশ্য। এভাবেই কিছুক্ষণ বাদে বাইসনের দেখা পেলাম—পেশীবহুল বিরাট চেহারা, অনেকটা বড় মোষের মত, জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে গাড়ির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তবে হরিণ বা বাইসনের দলগুলির ভিতরে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম; তারা আমাদের মত দর্শকে যথেষ্টই অভ্যস্ত, কারণ সার্চলাইটের আলো তাদের মধ্যে বিশেষ ভাবান্তর সৃষ্টি করল না। এদের মধ্যে বুনোভাব নেই বললেই চলে, প্রায় গৃহপালিত জীবজন্তুর মতই নিশ্চিন্ত, শান্তিপ্রিয় এরা। অভ্যস্ত হওয়ার কারণও আছে; আমাদের ভ্যানের সঙ্গে সঙ্গেই আরও বেশ কয়েকটি গাড়িকে দেখলাম একই রাস্তায় বেরিয়েছে সার্চলাইট নিয়ে—এরকমই নিশ্চয়ই আরও 'রুটে' আরও গাড়ি চলছে। তাদের শব্দ আর আলোর ঝলকানি দেখে নিজেদেরই অপরাধী মনে হচ্ছিল, এভাবে বনের জীবজন্তুদের শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য। যাই হোক, এই বনে পশুগুলো অন্তত নির্ভয়ে থাকতে পারে, এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিলাম।

গাড়ি যখন হাওয়ার বেগে ছুটে চলেছে সামনে আলোর ঝলক ফেলতে ফেলতে, তখন হঠাৎ পিছনে তাকিয়ে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সেখানে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, শুধু কোথাও কোথাও জোনাকির ঝিকিমিকি—সার্চলাইটের আলোয় তৈরী মায়াবী পরিবেশে ভুলেই গেছি যে এই ভয়ানক জঙ্গলে এখন গাঢ় অন্ধকার এবং সেখানে গাছের তলায়, ঝোপে ঝাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে

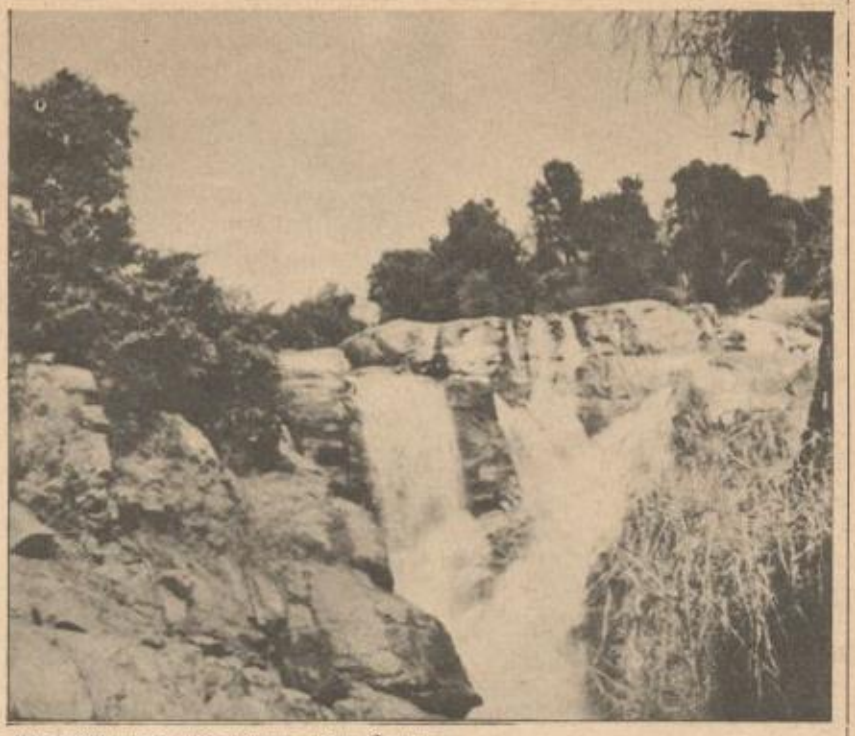

দশম জলপ্রপাতের জলের ধারা পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে পড়ছে

বাইসন, হরিণের দল, হয়ত বা হাতী আর বাঘও। যদি এর মধ্যে হঠাৎ গাড়ি খারাপ হয় তো সকলের কি অবস্থা হবে! ভ্যানের ছাদের বাইরে মাথা বার করে দাঁড়িয়েছিলাম; এবার মনে হতে লাগল পিছনের ঐ কালো রাতের অন্ধকারের থেকে বেরিয়ে হঠাৎ যদি কোন বুনো হাতী এসে আক্রমণ করে! জংলী হাতীর দলের দুর্দান্ত স্বভাবের কথা অনেক শুনেছি; একটা ভ্যান উল্টে দেওয়া তাদের কাছে কিছুই না। এর আগে অবধি মনে হচ্ছিল যেন পুরো ব্যাপারটা একটা অ্যাডভেঞ্চার, কিন্তু এবার সত্যিকারের বিপদের গন্ধ টের পলাম।

মনের মধ্যে ভয় নিয়েও অবশ্য জঙ্গলের মধ্যে আরও কিছুক্ষণ ঘুরলাম হাতী দেখার আশায়। দুর্ভাগ্য আমাদের যে একটাও জংলী হাতী দেখতে পাইনি। পরের দিন ভোরবেলা দেখলাম জঙ্গলের আর এক রূপ। হাতীর পিঠে চড়ে সকালবেলা গেলাম সেই একই বনের মধ্যে—দিনের আলোয় কি অপূর্ব সবুজের ছড়াছড়ি! কোথাও নরম সবুজ কচি ঘাসের মধ্যে হরিণের দল শুয়ে আছে, তাদের খয়েরীর মধ্যে সাদা ছিট দেওয়া চিক্কণ দেহের নিশ্চিন্ত বিশ্রামের ভঙ্গীটি গল্পে পড়া তপোবনের শান্তিশ্রীর কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। কোথাও আবার গাঢ় সবুজ রঙের উঁচু ডালপালা মেলা গাছেরা গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। এরই মধ্যে সুঁড়িপথ দিয়ে আমাদের হাতী হেলতে-দুলতে চলেছে; হাতীর পিঠে এত উঁচুতে বসার দরুন জঙ্গলের এক অপূর্ব 'ভিউ' পাচ্ছি, সব গাছের মাথার যেন কাছাকাছি চলে এসেছি, কখনও আবার খোঁচা এড়াতে ডালপালা ভাঙতে হচ্ছে। হাতী অবশ্য নিজেও চলতে চলতে সামনে ছোটখাট গাছ শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে উপড়িয়ে ভেঙে ফেলে দিচ্ছে। এভাবে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে হঠাৎ হাতী একজায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকিয়ে দেখি সামনেই এক বাইসন পরিবার। পরিবারের কর্তা অপ্রত্যাশিত উৎপাতে বিরক্ত হয়ে শিং নাড়িয়ে দৃপ্তভঙ্গিতে এগিয়ে এল। যেন সতর্ক করছে যে তার পরিবারকে যেন আমরা বিরক্ত না করি। কি অপূর্ব সেই ভঙ্গী! এদের স্বাস্থ্যের দীপ্তিও অসাধারণ—একটু কালো-বাদামীতে মেশানো চামড়ার আড়ালে ঢেউ-খেলানো পেশীর বাহার। এদের শান্তির আর ব্যাঘাত না ঘটিয়ে হাতী আমাদের পিঠে নিয়ে এগিয়ে চলল আরও গভীর জঙ্গলের দিকে অত্যন্ত সরু সেই সুঁড়িপথ, অনেক সময়ে গাছের ডাল ভেঙে পথ করে নিতে হচ্ছে, গাছের পাতা ভেদ করে অল্প ঝিকিমিকি রোদ এসে পড়লেও স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা চারদিক, অনেক জায়গায় আবার পথের একধার থেকে আর একধার জুড়ে গাছের মধ্যে বোনা মাকড়সার জাল। বিচিত্রবর্ণের বিরাট আকারের মাকড়সার বোনা এই জালে রোদ পড়ে চিকচিক করছে। মাহুতের কাছে শুনলাম যে গত তিন মাসে এই পথ দিয়ে কোন হাতীকে তারা আনেনি, কারণ বর্ষায় সাপের ভয়ে তারা এরকম ঘন জঙ্গলে ঢোকে না। নিবিড় অরণ্যের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে চেনা-অচেনা সব ডাক, কোনটা পাখির, কোনটা হনুমানের, আবার কোন ডাকের উৎস আমাদের অজানা। এরই মধ্যে মাহুত ইশারায় দেখাল একটি উঁচু চাতালের পাশে এক গুহা সেটা নাকি বাঘের ডেরা। মাহুতের মতে বাঘ আশেপাশেই থাকে, আমরা টের না পেলেও সে ঝোপঝাড়ের ফাঁক থেকে নিশ্চয়ই আমাদের দেখছে। গা-ছমছমে বনের মধ্যে সেই নির্জন

গুহার দিকে তাকিয়ে মনে হল ওখানে বাঘের বাস হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। অবশ্য তার দর্শন আমরা পাইনি।

এর পরে বনের যে অংশে এলাম, সেখানে জঙ্গল পাতলা-হয়ে এসেছে, গাছগুলো আর একটু ছাড়াছাড়া। এখানকার গাছের সৌন্দর্য আবার অন্য ধরনের ; সরু সরু লতানো গুঁড়ির গাছ একে অন্যকে পেঁচিয়ে উঠে গেছে বহুদূরে। তাদের গুঁড়ি আর ডালপালার প্রসারের ভঙ্গিমা এত বিচিত্র যে মনে মনে স্থপতি প্রকৃতির তারিফ না করে পারলাম না। এর পরে হাতী নিয়ে গেল একটু খোলা এক জায়গায়—তাকিয়ে দেখি এক বিরাট জলাশয়—সেখানে হাতীরা জল খেতে আসে। ইতস্তত গাছের গুঁড়ি ছড়ানো ; কেউ যেন মটকে ভেঙে দিয়েছে। মাহুতের কাছে শুনলাম এগুলো হাতীর দলেরই কাজ। দিনের আলোতেও অবশ্য বুনো হাতীর দেখা পেলাম না। এগিয়ে চললাম আরও—সামনে এল এক খোলা প্রান্তর, ঘন ঘাসের চাদর বিছানো। মধ্যে মধ্যে বড় গাছ, তাদের মাথা হলুদ ফুলে ভর্তি। কাছাকাছি কয়েকটি গাছে ল্যাজঝোলা হনুমানেরা বসে কী যেন ফল খাচ্ছে। সামনের ঘন উঁচু ঘাসের মধ্যে থেকে হঠাৎ একটি হরিণ (বা হরিণী) আমাদের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে পরমুহূর্তেই লাফাতে লাফাতে কাছের জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল। চকিত হরিণীর উপমা যে বাহুল্য নয়, তা সম্যক উপলব্ধি করলাম। আর অরণ্যের স্বাভাবিক পরিবেশে এদের সৌন্দর্য উপভোগ করে জালের বেড়ার পিছনে দেখা চিড়িয়াখানার হরিণগুলোর জন্যে মনে মনে খুব কষ্ট পেলাম। ইতিমধ্যে হাতী আরও এগিয়ে চলেছে, রোদের তেজে বুঝতে পারছি বেলা বেড়েছে। হঠাৎ সামনে চোখে পড়ল গাড়ি যাওয়ার রাস্তা আর অদূরেই দেখি জঙ্গল এলাকা থেকে বেরোনোর গেট। মনখারাপ হয়ে গেল—জঙ্গলের নেশা কাটিয়ে ওঠা সহজ কথা নয়। খুব ইচ্ছে করছিল হাতীর পিঠ থেকে নেমে পিছনে ফেলে আসা গাছেদের ভিড়ে কিছুক্ষণের জন্য এদিক-ওদিক ইচ্ছামত ঘুর আসি। কিন্তু তা তো হবার নয়। তাই এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিলাম যে বেতলা থেকে নেতারহাট যাবার রাস্তাও তো বনের মধ্যে দিয়েই ; অন্তত আরও কিছুক্ষণ ছায়ায় ঘেরা অরণ্যের সঙ্গ পাওয়া যাবে !

বেতলা থেকে আবার গাড়িতে রওনা হলাম নেতারহাটের উদ্দেশে। এবার যাত্রা শুরু হল জঙ্গলের পথে। যেহেতু বেতলায় হাতীর দেখা পাইনি, যেহেতু মনে ক্ষীণ আশা ছিল যে এই পথে হয়ত হাতীর দেখা মিলবে (অনেকেই এখানে হাতীর দর্শন পেয়েছেন), কিন্তু গোটা পথটাতে একটা বনবিড়াল ছাড়া আর কোনও বন্যপ্রাণী চোখে পড়ল না। অবশ্য জঙ্গল দেখার অভিজ্ঞতা নতুন বলেই হয়ত এই হতাশায় মন ভেঙে পড়েনি। বরং গাড়ির জানলা দিয়ে মাথা বার করে অরণ্যের ছবি 'নিয়েছি মোর দু চোখ পুরে'। যত লোকই এখান দিয়ে গিয়ে থাকুক না কেন, এ আমার একান্ত আপনার 'অচেনার আনন্দ'। আকাশ ছোঁয়া গাছেদের দলে দেখলাম আমাদের অতি-পরিচিত বাঁশঝাড়ও আছে, আশ্চর্য ব্যাপার, গ্রামবাংলার বাঁশঝাড়ের তুলনায় এগুলো অনেক বেশী লম্বা। হঠাৎ একটু জলের ছিটে চোখে মুখে লাগতে দেখি কখন যেন এক ছোট্ট নদী আমাদের গাড়ির টায়ারের তলায় চলে এসেছে। এই নদী এবং আরও ছোট ছোট ঝরনার মজা হল যে এদের গতিপথ রহস্যাবৃত। সমতলের নদীর মত অনেকটা জায়গা জুড়ে চোখ এদের সঙ্গে চলতে পারে না, বনের পথের বাঁকে হঠাৎ দেখা দিয়েই এরা অদৃশ্য হয়ে যায়—যেন হাতছানি দিয়ে বলে তাদের পিছু নিতে।

নেতারহাটের দিকে যাওয়ার পথে ধীরে ধীরে আমরা এই জঙ্গলকে পিছনে ফেলে এলাম। এবার চোখে পড়ছে উঁচু সব পাহাড়—তাদের কোলে ছোট ছোট গ্রাম। এক জায়গায় দেখি অনেক লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে কোথায় যেন চলেছে ; কিছুদূর এগিয়ে দেখা গেল সে গাঁয়ে সেদিন হাটবার। যে যার পসরা সাজিয়ে বসেছে হাটে। এখানে অনেক আদিবাসী মেয়েদের দেখলাম। তামার পয়সার গয়নায় সুসজ্জিতা। যে পাহাড় এতক্ষণ দূরে দেখছিলাম, কয়েক ঘণ্টা বাদে তাদেরই একটাতে গাড়ি নিয়ে চলল আমাদের। সেই পাহাড়ের ধার ঘুরে অন্য পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে একে বেঁকে পথ এগিয়ে চলেছে। এ-পাহাড় ও-পাহাড় করে আমরা সমতল থেকে অনেকটা উপরে উঠে গেছি। চারপাশে গাছের ধরন পাল্টাতে শুরু করেছে ; দেখা যাচ্ছে সরলবর্গীয় (পাইন জাতীয়) গাছ, হাওয়ায় একটা ঠাণ্ডা ভাব দেখা দিয়েছে। অনেকটা চড়াইয়ের পথ ঘুরে অবশেষে পৌঁছলাম, নেতারহাটে। উচ্চতা প্রায় চার হাজার ফিট —হাবেভাবে কিন্তু নেতারহাট অন্যান্য পাহাড়ী শহরের থেকে অনেকটাই আলাদা। এখানে এখনও দার্জিলিং-জাতীয় পাহাড়ী শহরের বিলিতি পালিশটা পড়েনি—কিছুটা একটেরে এই জায়গা তুলনায় নেহাতই সাদামাটা অবশ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেও নেতারহাট দার্জিলিং-এর থেকে অনেক পিছিয়ে। হিমালয়ের দৃশ্য না পেলেও এখানে ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে পাহাড়ের শ্রেণীর এক চোখ জুড়ানো 'ভিউ' আছে। অনেক নীচে চকচকে ফিতের মত নদী সর্পিল ভঙ্গীতে বয়ে চলেছে মাঠ ও ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে, তার পিছনে ঢেউ খেলানো পাহাড়ের সারি একটার পর একটা, যেন তাদের শেষ নেই ! সব মিলিয়ে প্রকৃতির তুলিতে আঁকা এক অপূর্ব ছবি। নেতারহাটে এটিই হল সূর্যোদয় দেখার 'স্পট'। সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখার জন্য আর একটি জায়গা আছে, তার নাম ম্যাগনোলিয়া পীক। এখানে বহু প্রশংসিত সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়, কোনটাই মনে রাখার মত সুন্দর লাগেনি। বরং নেতারহাটের স্মৃতি আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। অন্য কারণে ; কারণটা হল ছোট্ট একটা 'ট্রেক'।

ট্যুরিস্ট বাংলোর সামনে পাহাড়ের একেবারে নীচে নদীর ঝিকমিকে ধারা আমাদের সকলকেই টানছিল তার তীরে। সূর্যোদয় দেখার পর ঠিক হল নদীর ধার অবধি হেঁটে নামা হবে। বাদ সাধল স্থানীয় লোকেরা—জঙ্গলের মধ্যে নাকি হাঁটার মত কোন রাস্তা নেই, সুতরাং আমাদের না যাওয়াই ভাল। আমরা অবশ্য এ সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়লাম নদীর খোঁজে। এবার শুরু হল এক সত্যিকারের অ্যাডভেঞ্চার। পাহাড়ের গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি গাছের মধ্য দিয়ে সরু পায়ে-চলা পথ নেমে গেছে নীচে। সেই পথ আবার এক জায়গায় মিশে গেছে একটা মরা নদীর খাতে। সেখানে যে জল বইত, এখন শুকিয়ে গেছে, তা টের পেলাম নদীবক্ষের নুড়ি-পাথর দেখে। ছোট ছোট অসংখ্য নুড়িতে পা পিছলাতে পিছলাতে এগিয়ে চললাম আরও। চারদিকে কেউ কোথাও নেই, শুধু পাখির কিচিমিচি ছাড়া জঙ্গলের নিস্তব্ধতা অটুট ; চলার পথের আশেপাশে ছড়ানো প্রকৃতির সম্পদ —কত ধরনের ফার্ন, কত রকমের লতা-গুল্ম যে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কখনও পা হোঁচট খাচ্ছে গাছ থেকে নীচে পড়া পাইন কোণে, কখনও বা অদ্ভুত আকারের কোন গাছের গুঁড়িতে। শুকনো ডাল ভেঙে লাঠি তৈরি করে নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে চলেছি গাছেদের সঙ্গে ভাব করতে করতে। মনে হচ্ছে যেন আমাদের আগে কেউ কোনদিন এখানে আসে নি ; সত্যিই আমরা পাইওনিয়ার !

এভাবে চলতে চলতে এক সময় এসে পৌঁছলাম একটু খোলা এক জায়গায়—সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল রোদমাখা এক কালো পাথরের চাতাল, তার আশেপাশে শুকনো হলুদ ঘাসে হেমন্তের ঝরাপাতার নকশা। ঘাম মুছতে মুছতে গিয়ে বসলাম চাতালের উপর ; সামনে পাহাড়ের কোলে বনের দৃশ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। বনে তখন হেমন্তের রঙ ধরতে শুরু করেছে, তাই সবুজ গাছের ভিড়ে মাঝে-মধ্যে উঁকি মারছে কমলা, বাদামী আবার কখনও বা পাতা ঝরিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ ন্যাড়া গাছ। পায়ের পাশে পড়ে আছে হালকা নরম কমলা রঙের শুকনো পাতা, একটু কৌকড়ানো তার গা—কালো পাথরের বুকে তার রঙের বাহার যেন আরও খুলেছে ! প্রকৃতির সৌন্দর্যে নেশা ধরে গেছিল ; কতক্ষণ যে বুঁদ হয়ে বসেছিলাম তা খেয়াল নেই। খেয়াল হতে দেখি নদীর তীর অবধি যাবার মত সময় হাতে নেই। অতএব সেখান থেকে চড়াই ভেঙে আবার ফিরে এলাম বাংলোয়। দেখতে দেখতে নেতারহাট পর্বও শেষ।

এবার বাক্স গুছিয়ে ঘরে ফেরার পালা। কলকাতার নিয়মে বাঁধা জীবনে আবার ফিরে যাওয়ার কথা মন মানতে চায় না। বারে বারেই অনুভব করে পিছুটান—সেই সবুজ, সেই আলো-আঁধারি, সেই ছুটে চলার। তবু যেতে হবে। মনকে বোঝাই যে রুটিন-বাঁধা প্রাত্যহিকী থেকে ফাঁকি দিয়ে পালানো বলেই তো ছুটির দিনগুলো এত ভাল লাগে ! তাতেও যে 'দিনযাপনের গ্লানি'র স্মৃতি মনকে বিমুখ করে তোলে। তখন ছোট্ট একটা উৎকোচে অশান্ত মনকে শান্ত করি—আবার আসব। জঙ্গল, পাহাড়, সবই তো আমার অপেক্ষায় আছে, থাকবে। নিয়মের বেড়াজাল কেটে আবার ছুটে আসব এই সবুজ স্বপ্নের রাজ্যে।